৯.১.৩ সাঁওতাল অভ্যুত্থান

সাম্প্রতিককালের জনৈক গবেষক কে. সুরেশ সিং মন্তব্য করেছেন—ভারতীয় কৃষক সহ অন্যান্য যে-কোনো গোষ্ঠীর থেকে অনেক বেশি জঙ্গি ও হিংস্র বিদ্রোহে শামিল হয়েছিলেন ভারতের উপজাতিরা। ব্রিটিশ-বিরোধী গণসংগ্রামে উপজাতিদের একটি গৌরবময় ভূমিকা ছিল। এই উপজাতি বিদ্রোহগুলির মধ্যে ১৮৫৫-৫৬ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। প্রকৃতপক্ষে সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল উপজাতীয় সামাজিক সংহতি এবং বহিরাগতদের হস্তক্ষেপ ও অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিবাদে আঞ্চলিকতার চেতনার সংগ্রামী বহিঃপ্রকাশ। অন্যান্য উপজাতিদের মতোই সাঁওতালরাও ছিলেন ভারতীয় সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নিজেদের শ্রম ও প্রচেষ্টায় সাঁওতালরা সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলকে বাসযোগ্য ও উর্বর করে তুলেছিলেন। এই অঞ্চলকে বলা হত দামিন-ই-কোহ্। কিন্তু অচিরেই বহিরাগতরা এই অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করেন। ফলে সাঁওতালরা অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হন। বহিরাগতদের সাঁওতালরা বলতেন 'দিখু' বা বিদেশি। 'দিখু'দের মধ্যে ইংরেজরা এবং ভারতীয় বণিক ও মহাজনেরা পড়তেন। ইংরেজরা দামিন-ই-কোহ্-র জঙ্গল কেটে সাফ করে দিচ্ছিলেন। অন্যদিকে ভারতীয় মহাজনরা সাঁওতালদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাঁদের টাকা ঋণ দিতেন এবং অসদুপায় অবলম্বন করে তাঁদের জমিজমা দখল করে নিতেন। উভয়ের কার্যকলাপই সাঁওতালদের অর্থনৈতিক স্বার্থে আঘাত করেছিল। ঐতিহাসিক কালীকিঙ্কর দত্ত তাঁর *The Santal Insurrection of 1855-57* গ্রন্থে দেখিয়েছেন—মহাজনরা সাঁওতালদের সামান্য পরিমাণ টাকা ও কিছু চাল ধার হিসাবে দিতেন। তারপর তাঁরা ধূর্ত ও উৎপীড়নমূলক পন্থা অবলম্বন করে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দরিদ্র সাঁওতালদের ভাগ্য-নিয়ন্তা হয়ে বসতেন। অধমর্ণ সাঁওতালদের মহাজনেরা তারপর সারাজীবন ধরে নিয়ন্ত্রণ করতেন। ব্র্যাডলে-বার্ট (Bradley-Birt) তাঁর *Story of an Indian Upland* গ্রন্থে বলেছেন সাঁওতালদের মহাজনেরা 'ক্রীতদাসের স্তরে' (condition of slavery) নামিয়ে এনেছিলেন এবং মহাজনী শোষণ সরকারি আদালতগুলির পূর্ণ সমর্থন ও অনুমোদন পেয়েছিল। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে তাঁর *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস* গ্রন্থে বলেছেন—বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান থেকে মহাজনদের সঙ্গে প্রচুর বাঙালি ব্যবসায়ীও এসেছিলেন। তাঁরা সাঁওতালদের কাছ থেকে সস্তাদরে ফসল কিনে চড়াদামে বাইরে চালান দিতেন আর বাইরে থেকে নুন, তেল প্রভৃতি

পণ্য এনে সাঁওতালদের কাছে সেগুলি চড়াদামে বিক্রি করতেন। সাঁওতালদের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় করতে গিয়ে ব্যবসায়ীরা তাঁদের প্রতারিত করতেন এবং সাঁওতালদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাঁদের ওজনে ঠকাতেন। অনেক ক্ষেত্রেই আবার এই ব্যবসায়ীরা মহাজনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সাঁওতালদের চড়া সুদে ধার দিয়ে সাঁওতালদের শ্রমের ফসল ইচ্ছেমতো আদায় করতেন এবং তাঁদের জমি হস্তগত করতেন। ১৮৫০-এর দশক নাগাদ দেখা গেল সাঁওতালদের উৎপন্ন শস্যের প্রায় সবটুকুই ইংরেজ বণিকদের কুঠিতে বা ব্যবসায়ী মহাজনদের গুদামে জমা হচ্ছে। ইংরেজদের জঙ্গল কাটা এবং মহাজন-ব্যবসায়ীদের শোষণ ও প্রবঞ্চনা সাঁওতালদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সরকারি রাজস্বের ক্রমবর্ধমান চাহিদা। অরণ্যভূমিতে আবাদ করার জন্য সাঁওতালদের যখন ডাকা হয়েছিল তখন ইংরেজ সরকার বলেছিল যে তাঁদের কোনোরকম খাজনা দিতে হবে না। কিন্তু কালক্রমে দামিন-ই-কোহ্-কে সরকারি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার এক্তিয়ারে নিয়ে আসা হয় এবং রাজস্ব চাহিদা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ১৮৩৮ সালে কোম্পানি সরকার বছরে দুহাজার টাকা খাজনা দামিন-ই-কোহ্ থেকে আদায় করত। ১৮৫১ সালে এই পরিমাণ বেড়ে হয় প্রায় ৪৪,০০০ টাকা। তার ওপর ছিল রাজস্ব আদায়কারী নায়েব সুজায়ালদের অত্যাচার। সরকারি রাজস্ব আদায় করার পরও তারা বলপূর্বক সাঁওতালদের কাছ থেকে উৎকোচ হিসাবে দস্তুরি আদায় করত। বিভিন্ন ধরনের শোষণ ও উৎপীড়নের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে সাঁওতালদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। এই শোষণক্লিষ্ট দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষায় সাঁওতালরা ১৮৫৫ সালে নাগাদ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। দামিন-ই-কোহ্ এক বিধ্বংসী গণবিদ্রোহের পীঠস্থানে পরিণত হয়।

সাঁওতাল গণসংগ্রামের প্রেক্ষাপট হিসাবে ঐ অঞ্চলে অনেকগুলি ডাকাতি হয়েছিল ১৮৫৪ সাল নাগাদ। অধিকাংশ ডাকাতির ঘটনাই ঘটেছিল বাঙালি মহাজন ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে। ডাকাতির ঘটনার তদন্তকারী জনৈক পুলিশ অফিসার তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছিলেন—"ডাকাতির ঘটনাগুলির অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে ডাকাতরা কেবল খাদ্যসামগ্রী লুঠ করেছে এবং বন্দিরা বলেছে তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল খাদ্যসংগ্রহ করা। অনেকে অনাহার থেকে বাঁচার তাগিদে জেলে যাওয়ার জন্য অপরাধমূলক কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে" (In many cases entered as dacoities, nothing but articles of food were carried off, and the prisoners averred that their sole object was to procure food. Many committed offences against property for the purpose of being put in jail and thus escaping from starvation.)। ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ বলেছেন—"ক্ষুধা এবং উপনিবেশিক বিচারব্যবস্থার সমন্বিত প্রয়াস এই সম্প্রদায়কে আঘাত করেছিল। প্রথমে পরিণত পুরুষ সদস্যদের অপরাধীতে পরিণত করেছিল এবং তারপর তাদের নিজ নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল" (Hunger and the hand of colonial justice combined to hit the community in the guts, first by turning its most mature male adults into criminals and then by cutting them off from their families.)।

যেসব বাঙালি মহাজন ও ব্যবসায়ীরা সাঁওতালদের সবথেকে আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, ১৮৫৪ সালে সাঁওতাল ডাকাতদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল তারাই। রণজিৎ গুহর মতে— কৃষকদের দৃষ্টিকোণ থেকে ডাকাতিগুলি ছিল ধনী শোষকদের লুণ্ঠন করে অনাহারের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার বেপরোয়া প্রয়াস। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এরিখ হব্‌সবম্‌ বলেছেন— বিশ্বের বিভিন্ন অভ্যুত্থানে শোষিত মানুষের প্রতিবাদের আদিম অভিব্যক্তি (primitive form of protest) হিসাবে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। দরিদ্র সাঁওতালদের ডাকাতির ঘটনাও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু কোম্পানি সরকারের আইন সাঁওতালদের এই 'অপরাধ'কে ক্ষমার চোখে দেখেনি। সাঁওতালদের ডাকাতির অপরাধে কঠোর শাস্তি দেওয়া হল। মহাজন ও ব্যবসায়ীর দল কিন্তু তাঁদের প্রবঞ্চনার জন্য কোনো শাস্তি তো পেলেনই না, উপরন্তু সরকারের তরফ থেকে তাঁদের মদত দেওয়া হয়েছিল।

প্রশাসনের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি সাঁওতালদের বিক্ষুব্ধ করেছিল এবং সরকারি আইনের নিরপেক্ষতার প্রতি তাঁদের মোহভঙ্গ হয়। কিন্তু তাঁরা তখনও কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিহিংসাপ্রবণ হয়ে ওঠেননি। তাঁদের পরবর্তী প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল সুচিন্তিত যৌথ সিদ্ধান্তের ফল। ঐতিহাসিক বিনয়ভূষণ চৌধুরী লিখেছেন—"সাঁওতালি সূত্র থেকে জানা যায় বিচিত্র ধরনের নানা গুজব এ সময় সাঁওতাল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। স্পষ্টত এক অজানিত শঙ্কার ভাব তাঁদের মধ্যে প্রতিফলিত।" বন্দি সাঁওতালদের জবানবন্দি থেকে জানা যায় যে তখন থেকেই সম্মিলিত প্রতিরোধের ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রায় এক বছর পর ১৮৫৫ সালে জুলাই মাসে সাঁওতালরা তাঁদের সংগঠন 'হুল' গঠন করেন। 'হুল' ছিল তাঁদের তীব্র প্রতিশোধস্পৃহার ফসল। 'হুল'-এ নেতারা তাঁদের একাধিক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে দামিন-ই-কোহ্‌ থেকে অসাম্য দূর করার জন্যই তাঁরা প্রতিবাদের পথ গ্রহণ করেছেন।

ডাকাতি বা হামলার মধ্য দিয়ে যে প্রতিবাদের সূত্রপাত, তা ১৮৫৫ সালের জুন-জুলাই মাসে একটি সংগঠিত অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। এই অভ্যুত্থানকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন সিধু ও কানু দুই ভাই। এঁরা দুজনেই ছিলেন সাহসী ও দৃঢ় চরিত্রের মানুষ। সিধু ও কানু ঘোষণা করলেন যে সাঁওতালদের 'ঠাকুর' (দেবতা) তাঁদের সঙ্গে দেখা করে বলেছেন "দারোগা ও মহাজনদের খুন কর, তাহলে ন্যায়বিচার পাবে।" তাঁরা আরও বলেছিলেন যে 'ঠাকুর' আসার আগে এক টুকরো কাগজ আকাশ থেকে পড়েছিল আর তাতে লেখা ছিল "মহাজনদের সঙ্গে লড়াই কর তাহলে সুবিচার মিলবে।" 'ঠাকুর'-এর আবির্ভাব প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী লিখেছেন— "দিব্যপুরুষ প্রত্যক্ষভাবে দুই নেতাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা আসলে এক দুরূহ প্রশ্নের সমাধান ঃ কিভাবে তারা 'দিখু'দের কর্তৃত্ব ও শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবে। বিশুদ্ধ ধর্মীয় কোনো প্রসঙ্গ এতে ছিল না।" সরকারি তরফ থেকে এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হল ও বলা হল 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' সাঁওতালদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করার জন্যই এই ঘোষণা করা হয়েছে। গোটা সাঁওতাল সমাজ কিন্তু সিধু, কানুর ঘোষণাকে সত্য বলে মনে করেন এবং তাঁরা একে তাঁদের মুক্তির জন্য অতিপ্রাকৃত অলৌকিক শক্তির হস্তক্ষেপ বলেই মেনে নিয়েছিলেন। সুতরাং বিদ্রোহের সূচনা ও বিস্তারে এই ঘটনার তাৎপর্য অসামান্য। সিধু, কানুর ঘোষণা সাঁওতালদের দীর্ঘদিনের সংশয় ও অস্থিরতা দূর করেছিল।

সিধু, কানু এখানেই থেমে যাননি। সমস্ত সাঁওতালদের মধ্যে ও অন্যান্য উপজাতির মানুষের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রতীক হিসাবে শালগাছের ডাল পাঠানো হল। ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন প্রায় ১০,০০০ সাঁওতাল ভগনাদিহির মাঠে মিলিত হন। সিধু ও কানু সেখানে ঘোষণা করেন যে দৈবশক্তির নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত সাঁওতালকে অত্যাচারীদের নিয়ন্ত্রণ ভেঙে ফেলার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে শামিল হতে হবে। সমস্ত সাঁওতাল প্রতিজ্ঞা করেন যে তাঁরা বাঙালি ও উত্তর ভারতীয় মহাজনদের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিহ্ন করে নিজ-এলাকা পুনর্দখল করবেন এবং নিজেদের সরকার গঠন করবেন। তারপরই তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে পার্শ্ববর্তী পাঁচকাঠিয়া বাজারে গিয়ে হাজির হন এবং ৫ জন স্থানীয় মহাজন ও দিঘি থানার দারোগা মহেশলাল দত্তকে হত্যা করেন। বিদ্রোহীরা তারপর বারহাইতো বাজার লুণ্ঠন করেন। এরপর তাঁরা বিষ মাখানো তির, ধনুক, কুঠার ও তলোয়ার হাতে বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সাঁওতাল বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। সাঁওতালদের সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও দুটি উপজাতি মাল ও ভুয়ানরা সাঁওতালদের সঙ্গে যোগ দেন। অভ্যুত্থান এক তীব্র ও ব্যাপক রূপ নিয়েছিল। ১৮৫৫ সালে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় বিদ্রোহীরা রাজমহল ও ভাগলপুরের মধ্যে যাবতীয় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেন। বিদ্রোহীরা সদর্পে ঘোষণা করেন যে সাঁওতালদের এলাকায় ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটেছে এবং তাঁদের নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একথাও বলা হয় যে সাঁওতালরা এখন থেকে আর ইংরেজ সরকারকে কোনোরকম খাজনা দেবেন না, কর তুলে দেবেন তাঁদের নেতা সিধু ও কানুর হাতে। ইংরেজ প্রশাসকেরা এই মারাত্মক ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। একদা নম্র ও বাধ্য সাঁওতালরা এতখানি প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে উঠতে পারেন এবং এরকম সুসংগঠিত ও জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন, এ ছিল তাঁদের কল্পনারও অতীত। সমসাময়িক সরকারি প্রতিবেনদগুলি থেকে এ ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বিদ্রোহ শুরু হবার পরই প্রশাসন কিছুটা থমকে গিয়েছিল। কিন্তু তাও খুব একটা কাল-বিলম্ব না করে, কোম্পানি সরকার কঠোর হাতে এই বিদ্রোহ দমন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৬ জুলাই মেজর বারোস্ একদল সিপাহি নিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে অগ্রসর হন। কিন্তু পিরপৈন্তির কাছে বারোসের বাহিনী সাঁওতাল বিদ্রোহীদের হাতে পরাজিত হয়।

দেখতে দেখতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। ভাগলপুর, সিংভূম, মুঙ্গের, হাজারিবাগ, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার একাংশ বিদ্রোহ কবলিত অঞ্চলে পরিণত হয়। পাকুড়ের জমিদারির অন্তর্গত অঞ্চলে গোচ মাঝির নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। বিদ্রোহীরা লক্ষ্মীপুর, লিটিপুরা, হিরনপুর, মানসিংপুর প্রভৃতি এলাকার বাজার অঞ্চলে ব্যাপক লুণ্ঠন চালান। ভৈরব ও চাঁদের নেতৃত্বাধীন একদল বিদ্রোহী পাকুড়ের রাজবাড়ি আক্রমণ করে সর্বস্ব লুণ্ঠন করেন। ১৩ জুলাই মাঝরাতে বিদ্রোহীরা অম্বর পরগনার জমিদারের কাছারি বাড়ি, বহু গুদাম ও ধানের গোলা লুঠ করেন। এই সময় অন্যান্য জাতির দরিদ্র মানুষেরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন। এক ইউরোপীয় নীলকরের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে বিদ্রোহীরা কামার, ছুতোর, কুমোর, তেলি ও গোয়ালা— এই পাঁচটি জাতের মানুষের কোনো ক্ষতি করেননি। ইংরেজ আমলা শেরউইল তাঁর অভিজ্ঞতার

বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—গোয়ালারা বিদ্রোহীদের তথ্য সরবরাহ করতেন। সেপ্টেম্বর মাসে সাঁওতাল অভ্যুত্থান চরম রূপ নেয়। বীরভূমের জেলাশাসক তাঁর প্রতিবেদনে বলেছিলেন—জেলার পশ্চিমভাগের পুরোটাই বিদ্রোহীদের হাতে চলে গেছে। বীরভূমের কালেক্টর রিচার্ডসন ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে জানিয়েছিলেন যে বিদ্রোহীরা বীরভূম জেলার উপেরবান্দা থানার অন্তর্গত ৩৪টি গ্রাম লুঠ করেছেন এবং প্রতিটি লুণ্ঠিত গ্রামেই চামড়া-বাঁধা বাঁশ পুঁতে রেখে গেছেন। এটা ছিল গ্রামগুলিতে সাঁওতালদের অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিতবাহী। সমসাময়িক সরকারি নথিপত্র থেকে জানা যায় যে বিদ্রোহীরা ইংরেজদের বাংলোগুলি আক্রমণ করেছিলেন এবং নীলকর সাহেব, রেলের ইউরোপীয় কর্মচারী এবং পুলিশ পদাধিকারীদের নির্বিচারে হত্যা করেছিলেন।

সাঁওতালরা যে সম্পত্তি লুণ্ঠন করতেন, সেগুলি তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতেন। বলাই মাঝি ও কানু গ্রেপ্তার হবার পর যে জবানবন্দি দিয়েছিলেন, তা থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। উইলিয়াম হান্টার সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন—অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন সাঁওতালরা হিন্দু মহাজন-ব্যবসায়ীদের প্রতারণার শিকার হতে অস্বীকার করেছিলেন, দরিদ্র কৃষিজীবী সাঁওতালরা হিন্দুদের ভূমিদাসে পরিণত হতে এবং সাঁওতাল দিনমজুরেরা তাঁদের ক্রীতদাসে পরিণত হতে অস্বীকার করেছিলেন। এই অস্বীকার করার প্রবণতাই তাঁদের বিদ্রোহী করে তুলেছিল। রাজমহল থেকে কোলগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ও বীরভূম ও ভাগলপুরে সাঁওতাল বাহিনী তাঁদের সশস্ত্র অভিযান চালিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা তাঁদের প্রতিরোধ সংগ্রাম দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যেতে পারেননি। এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য ইংরেজ সরকার সামরিক বাহিনী নিয়োগ করে। ১৮৫৫ সালের শেষদিকে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী সাঁওতাল বাহিনীর অনেকগুলি যুদ্ধ হয়। সাঁওতালদের সংগঠন যথেষ্ট দৃঢ় ছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংরেজ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। কালীকিঙ্কর দত্ত লিখেছেন—সাঁওতালরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন বটে, কিন্তু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁরা সাফল্য পাননি। সরকার এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য ৭ম এবং ৬৩তম দেশীয় পদাতিক বাহিনী নিয়োগ করেছিল। ১৮৫৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ 'হুল'-এর সংগঠন পুরোপুরি ভেঙে ফেলা হয়। কঠোর হাতে রাষ্ট্র এই অভ্যুত্থান দমন করে। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালাতে গিয়ে সিধু গ্রেপ্তার বরণ করেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। কানুও উপেরবান্দায় ১৮৫৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রেপ্তার হন। এর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কানুর ফাঁসি হয়। এইভাবে সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই মহান নেতার জীবনাবসান হয়। ইংরেজ নিয়ন্ত্রিত দুটি সামসাময়িক পত্রিকা *Friend of India* এবং *Calcutta Review* কঠোর হাতে বিদ্রোহ দমন করার পক্ষে ওকালতি করেছিল। *Calcutta Review*-তে লেখা হয়েছিল যে এই 'রক্তপিপাসু অসভ্যদের' মধ্যে মৃত্যুভয় জাগিয়ে তুলে এবং হত্যালীলার ভয়ংকর প্রতিশোধ নিয়ে এদের শায়েস্তা করতে হবে। বস্তুত 'সুসভ্য ইংরেজ' শাসকেরা তাই করেছিলেন। সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের ইতিহাস রাষ্ট্রযন্ত্রের অমানবিক দমননীতির ইতিহাস। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—কঠোর হাতে সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করার

পরও সাঁওতালদের ওপর রাষ্ট্রযন্ত্র অমানবিক ও বর্বরোচিত আচরণ করেছিল। ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত কোনো কোনো এলাকায় সাঁওতালরা আবার সংগঠিত হতে প্রয়াসী হন। কিন্তু ১৮৫৫ সালের 'হুলে'-র মতো ব্যাপক ও তীব্র বিদ্রোহ আর ঘটেনি। সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল উনিশ শতকের ভারতবর্ষের গণসংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবময় অথচ দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায়।